যদি সোভিয়েত ইউনিয়ন ...

জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়

এখন নানা মহলেই কথাটা ঘুরে বেড়াচ্ছে। ইরাকে ইঙ্গমার্কিন আক্রমণের (২০ মার্চ-৯এপ্রিল, ২০০৩) আগে থেকে, আক্রমণের মাঝখানে এবং সাদ্দামযুগের অন্ত ঘটার পরেও কথাটা বলাবলি হচ্ছে, আজ যদি সোভিয়েত ইউনিয়ন থাকত তবে এই আক্রমণ কি সম্ভব হত? ইরাককে কি এমনিভাবে পড়ে পড়ে মার খেতে হত? বিজ্ঞান-টেকনোলজির কল্যাণে পৃথিবী আজ যে ঝিগ্রামে পরিণত হয়েছে সে গ্রামে একা মার্কিন প্রশাসন বিলেতের মতো এক নাবালককে সঙ্গে নিয়ে পারত এক-দ ারোগার ধমকের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে?

সোভিয়েতের প্রতি যাঁদের কিছু প্রেম ছিল, অনেক সমালোচনা সত্ত্বেও যাঁদের কিছু আস্থা ছিল তার প্রতি এবং যাঁরা নানা কারণে মনে করতেন সো ভিয়েতকে সমর্থন করা যায় না এবং তার চেয়ে বেশি, যাঁরা অনুভব করতেন সোভিয়েতের সমালোচনা — নিন্দা করা এবং পারলে তাকে আক্রমণ করা এক পবিত্র কর্তব্য, এমনকি যাঁরা সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন সোভিয়েতের অস্তিত্বের প্রতি (যেন তা-ও সম্ভব), এমন সব মহলেই কথাটা বলাবলি হচ্ছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্মই হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধের সূত্র ধরে। প্রথম মহাযুদ্ধের মাঝখানেই শ দেশে বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে যে-বিপ্লব ঘটে যায়, যাকে বলা হয় অ*াবর বিপ্লব (পঞ্জিকান্তরে নভেম্বর বিপ্লব)। তার সঙ্গে যুক্ত ছিল, বলা যায়, তার এক প্রধান ভিত্তি ছিল একটি তত্ত্ব যা একান্তভাবে সাম্র াজ্যবাদের স্বাস্থ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত।

সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে তৎকালে প্রচলিত বিপ্লবসম্ভাবনা সম্পর্কিত একটি দৃঢ় ও বড় ধারণা ভেঙে দিয়ে লেনিন তাঁর পার্টিকে নিয়ে নেমে পড়েছিলেন পশ্চ াৎপদ, সামন্তবাদী, দুর্বল, অতি দুর্বল ধনতান্ত্রিক বিকাশের দেশ, শ দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা করতে। তাঁদের মনে হয়েছিল বিকশিত পুঁজিবাদে এক সময় অচলায়তন সৃষ্টি হলে, সমাজ ও উৎপাদন ব্যবস্থা বদ্ধ জলায় পরিণত হলে, হয়ত কখনও কোনও দেশে শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লব সংঘটিত হতে পারে, হতেই পারে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের নিজের ঘরের বিবাদ যুদ্ধে পরিণত হয়ে একটা সুযোগ তুলে দিয়েছে বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণীর হাতে। সাম্রাজ্যবাদের যে-শৃংখল ঝিকে পিছমোড়া করে বেঁধেছে, সে শৃংখলের দুর্বলতম জায়গাটি নগ্ন হয়ে গেছে এই যুদ্ধে। সেই জায়গাটিতে আঘাত করতে পারলে শ্রমিকদের নিজস্ব এক রাষ্ট্র হয়ত প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। শোষণহীন এক সমাজগঠনের পথ খুলে দিতে পারে সে আঘাত। এবং আঘাত করার সেই দুর্বলতম জায়গাটিই হলো নড়বড়ে শাসন আর ঘৃণিত রাজতন্ত্রের দেশ রাশিয়া। রাশিয়ায় বিপ্লব হয়েছিল। বিশ্ব প্রথম শ্রমিক শ্রেণীর নিজস্ব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেদেশে। বলশেভিকরা ও তাদের নেতা লেনিন বসেছিলেন র াষ্ট্রক্ষমতার কেন্দ্র ক্রেমলিনে।

বিপ্লব-পরবর্তী অপরিসীম দুর্দশাগ্রস্ত এবং অস্থির শদেশের সেই দুঃসময়েও লেনিন স্বপ্ন দেখতেন এক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের এবং তাঁর সহযোদ্ধ াদেরও দেখাতেন সেই স্বপ্ন।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সেই শৈশবে যাঁরা লেনিনকে ও শ দেশকে দেখেছিলেন, তাঁদের একজন এইচ. জি. ওয়েল্‌স্‌। নিদাণ অভাব ও দারিদ্র, প্রবল শীত, গৃহযুদ্ধ ও বৈদেশিক আক্রমণের মাঝখানে বসে খুব শান্ত ভঙ্গিতে লেনিন তাঁকে নিজের স্বপ্নের ভাগ দিয়েছিলেন। তাঁর চেয়ারের পেছনে দেওয়ালে ঝোলানো ম্যাপ দেখিয়ে তাঁকে বুঝিয়েছিলেন, সমগ্র দেশে বিদ্যুতায়ন ও সোভিয়েতের হাতে ক্ষমতা — এই দুইয়ের সংযোগে কীভাবে বদলে যাবে শদেশ। গড়ে উঠবে সম াজতন্ত্র। সে দেশ পরিণত হবে বিশ্বের সবচেয়ে সমৃদ্ধ, সবচেয়ে শক্তিশালী এবং সর্বরকম গ্লানিহীন, মুক্ত এক দেশে। নূতন সেই দেশই পথ খুলে দেবে বিশ্বের মুক্তির।

স্বদেশে ফিরে ওয়েল্‌স্‌ লেনিনকে আখ্যা দিয়েছিলেন, 'ক্রেমলিনের উন্মাদ স্বপ্নদর্শী।' কথাটি ভুল নয় একেবারেই, খানিকটা পাগল এবং পাগলের মতো স্বপ্নদর্শী না হলে কেউ বিপ্লবী হতে পারেনা। এবং কে না জানে, লেনিন ছিলেন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ এক বিপ্লবী।

লেনিনের সেই স্বপ্নে শুধু শ দেশের সমৃদ্ধি ও তার শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি ছিল না, ঝিময় শোষণ ও পীড়নের শৃংখলে আবদ্ধ ও নিষ্পেষিত মানবতার মুক্তিও ছিল। অ*াবর বিপ্লব অঙ্গীকারবদ্ধ ছিল তার আন্তর্জাতিক দায়িত্ব পালনে।

লেনিনকে চলে যেতে হয়েছে। অকালেই। ট্রটস্কি ও বিপ্লবের অন্যান্য অনেক গুত্বপূর্ণ নেতা অপসৃত হয়েছেন মঞ্চ থেকে। দিনদিন সোভিয়েত ইউনিয়ন বদলে বদলে গেছে, ক্রমাগত। দ্বিতীয় ঝিযুদ্ধের বিজয়ী নায়ক স্তালিনের জীবনাবসান ঘটেছে। তারপর শু হয়েছে নতুন এক পর্যায়। নতুন পৃথিবীতে সোভিয়েত ইউনিয়ন খুঁজে ফিরেছে নতুন পথ। কিন্তু প্রয়োগে কিছু অস্থিরতা, কিছু দ্বিধাদ্বন্দ্ব বা ভুল-ত্রুটি কখনও কখনও দেখা দিলেও জন্ম মুহূর্ত থেকে অস্তিত্বের প্রায় শেষ পর্যায় পর্যন্ত সে অবিচলভাবে পালন করে গেছে, তার আন্তর্জাতিক দায়িত্ব ও ভূমিকা।

'প্রায়' কথাটির ব্যবহার বোধ করি অনিবার্যই ছিল। মাঝে মাঝে, বিশেষ করে এক পর্যায় থেকে আর এক পর্যায়ে যাওয়ার মধ্যবর্তীকালে কিছু মাঝারি মেধার নেতাদের বাদ দিলে, সোভিয়েত ইউনিয়নের সাত দশকের কিছু অধিককালের অস্তিত্ব-সময়কে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। লেনিনের যুগ, স্তালিনযুগ, খ্রুশ্চভকাল, ব্রেঝনেভের দীর্ঘ যুগ এবং অবশেষে গর্বাচভের সময়। এই পাঁচ পর্বের শেষ পর্বটি একেবারেই ভিন্ন চরিত্রের। বাকি চারটি পর্ব সম্পর্কে যার যে সমালে াচনাই থাক, সোভিয়েতের সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতা, নিপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়াবার আগ্রহ এবং প্রগতি আন্দোলনকে যথাসাধ্য সাহায্য করার মানসিকতা বিষয়ে ক ারও কারও কিছু সংশয় থাকলেও, সন্দেহের অবকাশ কম।

বস্তুতপক্ষে সেই কারণেই কথাটা উঠেছে, সোভিয়েত থাকলে ইরাকে কি ইঙ্গমার্কিন বোম্বেটেগিরি সম্ভব হতো?

।। দুই ।।

সোভিয়েত তার সাত দশকের ঝোড়ো জীবনে নানা মহলের নানা সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছে। জন্মলগ্ন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত তার বিদ্ধে যে প্রধান অভিযোগটি বারংবার নিনাদিত হয়েছে তা হল —

(১) সোভিয়েতে স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার বলে কিছু নেই। কমিউনিস্ট তথা সোভিয়েতের দর্শনই এইসব আদর্শ ও মূল্যবোধের বিরোধী। কমিউনিস্ট বিরোধী দর্শনের প্রবক্তারাই প্রধানত এই অভিযোগের উদগাতা। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থাকেই শ্রেষ্ঠতর বিবেচনায় যাঁরা সেই ব্যবস্থাকে রক্ষা ও শক্তিশালী করতে চান প্রধানত তাঁরাই এই অভিযোগ উত্থাপন ও রটনা করেন।

অন্যদিকে চীন বিপ্লব সফল হওয়ার পর এক দশক কাটতে না কাটতে, পঞ্চাশের দশকেই, তার বিদ্ধে সম্পূর্ণ বিপরীত মের অন্য একটি অভিযোগ ওঠে। এবং সেটা ওঠে কমিউনিস্ট মহল থেকেই।

(২) সাম্রাজ্যবাদের বিদ্ধে সরবে সোচ্চার হলেও সেভিয়েত ইউনিয়ন নিজেই সাম্রাজ্যবাদী। তার আধিপত্যবাদ পরিচিত সাম্রাজ্যবাদ থেকে কিছু ভিন্ন রকম, কিছু পরোক্ষ, কিছু প্রচ্ছন্ন এবং প্রায়শই সূক্ষ্ম। এই ঘরানার সমালোচকরা এই সাম্রাজ্যবাদের নাম দেন সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ। এই সমালোচনা ও তার প্রতিবাদ নিয়ে বহু তত্ত্ব, পাল্টা-তত্ত্ব রচিত হয়েছে। সেসব নিয়ে ঝিময় বিতর্ক চলেছে। সেসব বিতর্ক বহুক্ষেত্রেই নিতান্ত নিরামিষ তত্ত্বচর্চা থাকে নি। সমাজতন্ত্র ও বিপ্লবের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ ও উৎসর্গিত আবেগ নানাভাবে প্রকাশিত হয়েছে, বিস্ফোরিতও হয়েছে। শেষ পর্যন্ত ঝিময় কমিউনিস্ট আন্দোলন তার ঐক্য ও সংহতি হারিয়েছে। প্রথমে দু'টুকরো, তারপর তিন টুকরো, তারপর টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। ফলে হীনবল হয়েছে দেশে দেশে শোষণ-পীড়নের বিদ্ধে সংগ্রাম এবং তাতে, বলা বাহুল্য, শোষক-পীড়কের দলই প্রীত ও লাভবান হয়েছে।

সবকিছু সত্ত্বেও, মানতেই হবে, সোভিয়েত ইউনিয়ন লেনিনযুগ ও স্তালিনযুগে তো বটেই, এমনকি খ্রুশ্চভ ও ব্রেজনেভের সময়েও দুটি কাজ করে গেছে। (ক) প্রগতি আন্দোলনের প্রসার এবং (খ) সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা। এক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়ন অবশ্য সমালোচনার উর্ধে থাকতে পারে নি এবং তার বিদ্ধে তৃতীয় একটি সমালোচনা শোনা গেছে। এটাকে তৃতীয় না বলে দ্বিতীয় সমালোচনারই একটি অংশও বলা যায়।

(৩) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা প্রগতি ও বিপ্লবের আদর্শের প্রতি তার অঙ্গীকার দিয়ে যতটা নির্ধারিত হয়েছে, তার চেয়ে বেশি নির্ধারিত হয়েছে তার জাতীয়, অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক, এক কথায় রাষ্ট্রীয় স্বার্থের দ্বারা। তেমন তেমন ক্ষেত্রে, এই স্বার্থের কারণেই সে (ক) কোনও কোনও রাষ্ট্রের স্বৈরাচারী পদক্ষেপকেও সমর্থন করে গেছে। (খ) আবার কোনও দেশে কমিউনিস্টহন্তা স্বৈরাচারী সরকারকেও সোৎসাহে সমর্থন করতে তার বাধেনি। এর ফলে সেসব দেশের প্রগতিশীল ও কমিউনিস্ট আন্দোলন এবং সে আন্দোলনে যুক্ত মানুষদের কথা তার বিবেচনার মধ্যেও এসেছে কিনা সন্দেহ। অনেক দৃষ্টান্তই দেওয়া যায়। আপাতত দুটিমাত্র দেওয়া হল।

প্রথমটির দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষে ইন্দিরা গান্ধীর জরি অবস্থা ঘোষণা এবং সেই ঘোষণার অনিবার্য ফলশ্রুতি, নানা ধরনের স্বৈরাচারী পদক্ষেপকে সমর্থন। তখন এদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলন বহু বিভক্ত। জরি অবস্থায় তার একটি বড় অংশ অন্যান্য গণতন্ত্রী ও প্রগতিশীল ব্যক্তি ও শক্তির সঙ্গে নানাভাবে বিব্রত, হেনস্থা ও অত্যাচারিত হয়। তাঁদের অনেককে কারান্তরালেও পাঠিয়ে দেয় তখনকার স্বৈরাচারী শাসন।

বিপন্ন হয়ে পড়ে শোষিত ও নিপীড়িত মানুষের সংগ্রাম ও প্রগতিশীল মানুষের আন্দোলন। অন্য একটি অংশ কারাগারের বাইরেই থেকে যায়। তারা সোভিয়েতের অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ও সোভিয়েতের 'পণ্ডিতদের' মস্তিষ্কপ্রসূত তত্ত্ব অনুসরণ করে সরকারের স্বৈরাচারী পদক্ষেপকে বুর্জোয়াদের প্রতিক্রিয়াশীল অংশের বিদ্ধে প্রগতিশীল অংশের সংগ্রাম বলে ধরে নিয়ে সমর্থন করতে থাকে। স্বৈরাচারকে সমর্থনের জন্যে পরবর্তীকালে তাদের অনেক মূল্য দিতে হয় এবং ওইসব ঘটনার তিন দশক পরেও, আজও দিয়ে যেতে হচ্ছে।

দ্বিতীয়টির দৃষ্টান্ত স্বয়ং ইরাক, সাদ্দাম হোসেনের ইরাক।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অষ্টাদশ কংগ্রেসে ইরাকী কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ঘানেম সৌরি এসেছিলেন তাঁর পার্টির প্রতিনিধি হয়ে। সিপিআই-এর বাংলা মুখপত্র দৈনিক কালান্তরের প্রতিনিধিকে তিনি যে সাক্ষাৎকার দেন তা ওই পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় সেই বছরেই, ৭ এপ্রিল ২০০২ তারিখে। সাক্ষাৎকারটি পুনর্মুদ্রিত হয় কালান্তরের ১এপ্রিল ২০০৩ সংখ্যায়। তখন ইরাকে যুদ্ধ চলছে পুরোদমে। সভ্য ও বস্তুনিষ্ঠতার স্বার্থে পাঠক যেন স্মরণে রাখেন, এদেশে যারা সবচেয়ে সোচ্চারে ও সজোরে ইরাকে ইঙ্গমার্কিন আক্রমণের নিন্দায় ও প্রতিবাদে সংসদের ভেতরে ও পথে পথে আন্দোলনে নামেন, তাঁদের পুরোভাগেই ছিল সিপিআই।

সেই সাক্ষাৎকারের খানিকটা উদ্ধৃত করলে সাদ্দাম-শাসনের স্বৈরাচারী দিক কিছু স্পষ্ট হবে। সাক্ষাৎকারে একটি প্রশ্নের জবাবে তিনি পাল্টা প্রশ্ন করেন, /আচ্ছা বলতে পার আমাকে কেন এখন ব্রিটেনে থাকতে হয়? ১৯৭৮ থেকে চবিবশ বছর ধরে এদেশ ও-দেশ ঘুরছি, বাড়ির লোককে একটা চিঠি পর্যন্ত দিতে পারি না। কেন? ১৯৭৯-র পর থেকে কেন ইরাকের বুকে কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি (এই বছর থেকেই ইরাকে চূড়ান্ত ক্ষমতা সাদ্দাম হোসেনের করায়ত্ত্ব। ওই বছর থেকে মার্কিন আক্রমণে ৯ এপ্রিল ২০০৩-এ বাগদাদের পতন পর্যন্ত তিনি একাধারে ইরাকের রাষ্ট্রপতি এবং দেশের একমাত্র রাজনৈতিক দল বাথ পার্টির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন — জ. প. চ.)? ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৯ পর্যন্ত প্রায় আধা বেআইনি অবস্থায় কাটাতে হয়েছে। বেআইনি দশার আগেই কমিউনিস্ট নেতাদের একেকজনকে ১০-১৫ বছর করে জেল খাটতে হয়েছে কেন? কমিউনিস্ট পার্টির নামে তো আর মার্কিন দালালের অপবাদ দেওয়া যাবে না। তা হলে এসব কেন?*

ঘানেম মৌরির সাক্ষাৎকার থেকেই জানা যায়, শুধু কমিউনিস্ট নয়, যাবতীয় বিরোধী ব্যক্তি ও গোষ্ঠিরই বিধিলিপি — হয় নির্বাসন, নয় কারাগার। বহু কমিউনিস্টসহ যাঁরা পালাতে পারেননি তাঁদের অনেকেরই জুটছে মৃত্যুদণ্ড। সেই দণ্ডপ্রাপ্তদের মধ্যে একজন স্বয়ং সাদ্দামের জামাতা।

জাতিগোষ্ঠি হিসাবে উত্তর ইরাকে তুরস্কের সীমান্ত এলাকার কুর্দদের ওপর ইরাকী প্রশাসন যে-অত্যাচার চালায় তার তুলনা মেলা ভার। তাদের বিদ্রোহ দমন করতে রাসায়নিক অস্ত্র প্রয়োগ করতেও পিছপা হয় নি প্রশাসন। অন্তত এক লক্ষ কুর্দ সে সময় মারা যান। পাহাড়ে ও জঙ্গলে আশ্রয় নিয়ে কুর্দদের তিনটি গেরিলা গোষ্ঠি লড়াই চালিয়েছে বহুকাল ধরে। তাদের দুটি গোষ্ঠি এবার ইঙ্গ-মার্কিন আক্রমণে সহায়তা করে। তুরস্ক যেহেতু শেষ পর্যন্ত তাদের দেশের ওপর দিয়ে মার্কিন ফৌজ যেতে দিতে রাজি হয় নি, বস্তুতপক্ষে এই গোষ্ঠিদুটিই (কে-ডি-পি এবং পি-ইউ-কে) উত্তর ইরাকের বিমানবন্দর, মসুলের মতো গুত্বপূর্ণ শহর এবং মূল্যবান তৈলখনিগুলি দখল করে। বলা বাহুল্য, সময় হলেই তাদের সরিয়ে দিয়ে মার্কিন ফৌজ সে-সবের দখল নিয়ে নেয়।

কুর্দদের তৃতীয় গেরিলা গোষ্ঠিটি কুর্দিস্তান ওয়ার্কার্স পার্টি (পি-কে-কে)। ইরাকের অভ্যন্তরে কমিউনিস্ট পার্টির গুত্বপূর্ণ সংগ্রামের প্রতীক হয়ে টিঁকে আছে শুধু এরাই। পাঠক, স্মরণে রাখবেন, একসময় সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বাইরে যেসব দেশে কমিউনিস্ট পার্টি রীতিমত বৃহৎ হয়ে উঠেছিল তাদের অন্যতম ছিল ইরাকী পার্টি। ২০০৩-এর যুদ্ধের পর পি-কে-কে-র (হাল কী হয়েছে কে জানে।) ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি তাদের শত্রু। সে শত্রুর সহায়ক অন্য দুটি কুর্দ গেরিলা গোষ্ঠি তো তাদের চিরশত্রু। আবার বাথ পার্টি ও ইরাকী প্রশাসনও তাদের শত্রু। সীমান্তপারের তুর্কী প্রশাসন তো তাদের হাতে পেলেই কচুকাটা করবে। এত শত্রু নিয়ে টিঁকে থাকা কি সহজ কথা?

ইরাকে মুসলমানদের মধ্যে সিয়া সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু প্রশাসন ছিল সুন্নিদের করায়ত্ত্ব। সাদ্দাম নিজেও সুন্নি। সাম্প্রদায়িক অত্যাচারে সিয়ারা সমাজে ও রাষ্ট্রে তাদের প্রাপ্য স্থান পাওয়া দূরস্থান, স্বাধীনভাবে নিজেদের ধর্মাচরণও করতে পারে নি। অথচ আরব রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সাদ্দাম হোসেনের ইরাকই শিক্ষাদীক্ষায় জীবনাচরণে, জ্ঞানবিজ্ঞানে সবচেয়ে আধুনিক। ইসলামি মৌলবাদকে প্রশ্রয় দেয়নি প্রশাসন। বরং ধর্মের ব্যাপারে সবচেয়ে উদার আরব রাষ্ট্র ইরাক।

সে দেশের জনসংখ্যার ৩% খৃষ্টান। সাদ্দামযুগের অবসান ঘটার পরেও তাঁরা নির্দ্বিধায় ঘোষণা করেন, সাদ্দাম-শাসনে তাঁরা সম্পূর্ণ নিরাপদ ও স্বাধীন ছিলেন। ইরাকের গুত্বপূর্ণ এক নেতা, দেশের উপপ্রধানমন্ত্রী, তারিক আজিজ ধর্মে খৃষ্টান। একজন 'বিধর্মী'কে এমন উচ্চপদে বসানোর কথা অন্য কোনও আরব রাষ্ট্রে অভাবনীয়।

কিন্তু এই উদারতার লেশমাত্র টের পান নি সিয়া সম্প্রদায়ের মানুষ। তাঁদের অনেককেই তাই প্রাণরক্ষায়, ধর্মরক্ষায় দেশান্তরী হতে হয়। ঘানেম মৌরি ওই সাক্ষাৎকারে জানান, /দশ হাজার ইরাকীকে এখনও সৌদি মভূমিতে দুঃসহ জীবন কাটাতে হচ্ছে। ... সব মিলিয়ে প্রবাসী ইরাকীর সংখ্যা এখন ৪০ লক্ষ।* সংখ্যাটির ভয়ংকর তাৎপর্য বুঝতে হলে পাঠককে মনে রাখতে হবে ইরাকের মোট জনসংখ্যা ২২০ লক্ষ।

দেশান্তরী ইরাকী কমিউনিস্টরা সোভিয়েতের আশ্রয় ও নানা ধরনের সহায়তা পেয়েছে একথা যেমন ঠিক, তেমনি ঠিক ইরাক, ইরাকের এমন স্বৈরাচারী সরকারও তাদের সমস্ত ধরনের সাহায্য ও সহায়তা পেয়েছে। সরকারি স্তরে দুই রাষ্ট্রে বন্ধুত্ব হয়েছে। বেসরকারি স্তরে বাথ পার্টির সম্মেলনে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির 'ভ্রাতৃত্বমূলক' প্রতিনিধিদল হাজির হয়েছে (যেমন এসেছে এ দেশে জাতীয় কংগ্রেস দলের সম্মেলনেও। জরি অবস্থার মধ্যেও)।

সোভিয়েতের এই ভূমিকার পেছনে নানা যুক্তি ও কারণ নিশ্চয়ই কাজ করেছে। ঠাণ্ডা যুদ্ধের সেই পর্যায়ে জোট নিরপেক্ষ শিবিরে ইরাকের থাকাটা নিশ্চিত করা প্রয়োজন ছিল। শিক্ষাদীক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিজ্ঞান ও টেকনোলজির উন্নতিতে সাহায্য করে তাকে স্বয়ম্ভর করে তোলাও দরকার ছিল যাতে সে সাম্রাজ্যবাদ-নির্ভর হয়ে না পড়ে। এমনি আরও বহু যুক্তি নিশ্চয়ই ছিল। এসব যুক্তির সঙ্গে হয়ত বা সব যুক্তির উর্ধে ছিল, ইরাকের তেল। এবং সোভিয়েতের অস্ত্রশস্ত্র ও নানা সামগ্রী রপ্তানির জন্যে ইরাকের বাজার। খনি থেকে তেল তোলা, তা পরিশুদ্ধ করা, সযত্নে ও সাবধানে রক্ষা করা এবং পাইপের মাধ্যমে ও অন্যান্যভাবে চালান দেওয়ার জন্যে ইরাক যেসব অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ও কারিগরী দক্ষতা ব্যবহার করত তার বৃহদংশই যোগান দিত সোভিয়েত ইউনিয়ন। ইরাকের সঙ্গে তার তেলব্যবসায়ের যে-চুক্তি ছিল তা খুব বেশি করেই সোভিয়েতের পক্ষে অনুকূল ছিল। এবার যখন ইরাক আক্রান্ত হয় তখনও তার কাছে রাশিয়ার পাওনা ছিল বহু সহস্র কোটি ডলার। শুধুমাত্র সোভিয়েত আমলে ইরাককে দেওয়া ঋণের বকেয়ার পরিমাণই পাঁচ হাজার কোটি ডলার। রাশিয়া যেসব কারণে ইরাক আক্রমণের বিদ্ধে দাঁড়িয়েছিল এবং ফ্রান্স ও জার্মানিকে সঙ্গে নিয়ে শেষ পর্যন্ত বিদ্ধতা করে গিয়েছিল, তার একটি বড় কারণ নিশ্চয়ই ইরাকে তার অর্থনৈতিক স্বার্থ। শুধু সে নয়, বিরোধিতায় তার সঙ্গীদের সবার ক্ষেত্রেই কথাটি খাটে।

।। তিন ।।

পৃথিবীর বহু দেশের, নানা স্তরের অসংখ্য মানুষ কেন ভাবেন, আজ যদি সোভিয়েত ইউনিয়ন থাকত! এই প্রসঙ্গে একটা কথা বোধহয় ধরেই নেওয়া যায়, তাঁরা যে-সোভিয়েত ইউনিয়নের কথা ভাবেন ও বলাবলি করেন, তা প্রাক-গর্বাচভ যুগের সোভিয়েত ইউনিয়ন। সে সোভিয়েতের হয়ত নানা ত্রুটি ছিল, দুর্বলতা ছিল, জাতীয় তথা রাষ্ট্রীয় স্বার্থের ব্যাপার ছিল। কিন্তু ছয়- সাত দশক ধরে তার প্রবলভাবে সক্রিয় অস্তিত্বে কিছু বৈশিষ্ট্যও ছিল। সন্দেহ নেই, সেই বৈশিষ্ট্যের ইতিহাস এবং নানা ঘটনা ও দৃষ্টান্তই বহু মানুষকে এভাবে ভাবায়।

এইসব বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য

১) সোভিয়েত ইউনিয়নের আন্তর্জাতিকতাবাদের আদর্শ।

২) সেই আদর্শের প্রতি অঙ্গীকারের কারণে দেশে দেশে কমিউনিস্ট তথা প্রগতিশীল আন্দোলন ও সংগ্রামের সঙ্গে একাত্ম বোধ করা এবং নানাভাবে তাদের উৎসাহিত ও সাহায্য করা।

৩) প্রথমদিকে অন্যান্য রাষ্ট্র থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র চরিত্রের একটি রাষ্ট্র হিসাবে বিময় প্রভাব বিস্তারে সফল হওয়া।

৪) দ্বিতীয় বিযুদ্ধ পরবর্তীকালে দুই সুপার পাওয়ারের অন্যতম হিসাবে পৃথিবীতে শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখার কাজে সাফল্য।

সোভিয়েত ইউনিয়ন তখনও সুস্থিত হয় নি। লেনিনের 'উন্মাদ স্বপ্ন' রূপায়ণের কাজ শুও করা যায় নি। কিন্তু সেই পরিস্থিতিতেও লেনিনসহ সমগ্র সোভিয়েত নেতৃত্ব শুধু তাঁদের বিপ্লব বা শুধু নিজেদের দেশের কথা ভাবতেন না। পুঁজিবাদী দেশের শ্রমিক শ্রেণী থেকে উপনিবেশগুলির নিপীড়িত মানুষ, সমগ্র বিই ছিল তাদের ভাবনার বিষয়, তাঁদের আত্মীয়। সত্য অর্থেই সমগ্র বসুধা ছিল তাঁদের আত্মীয়ভূমি, বসুধৈব কুটুম্বকম। ভারতবর্ষ থেকে দক্ষিণ আমেরিকা পাঁচ মহাদেশের সব দেশই পড়ে তার মধ্যে। সেই জন্যেই শত ব্যস্ততা ও বিপন্নতার মধ্যেও তাঁরা ভাবেন ভারতবর্ষের মুক্তির কথা। ১৯২১ সালে কংগ্রেসের গয়া অধিবেশনে পৌঁছে যায় সোভিয়েতের বার্তা ভারতবর্ষের মানুষের স্বাধীনতার স্বপ্ন ও সাধনার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন ও সংহতি যে-বার্তার মূল কথা।

এ সংহতি প্রকাশ যে নিতান্ত কথার কথা নয়, এ উৎসাহদান যে কতটা বাস্তব ও ফলপ্রসূ হতে পারে তার প্রমাণ পাওয়া যায় অক্টোবর বিপ্লব পরবর্তী বিশ্বের দিকে তাকালেই। এ বিপ্লবের প্রভাবে ও প্রেরণায় একদিকে যেমন বিপ্লব ঘটে যায় ইওরোপের কোনও কোনও দেশে (সে বিপ্লব কেন সফল হয় নি, কেনই বা তা অায়ুষ্মান হতে পারে নি, সে এক অন্য আলোচনা), দূর দূর মহাদেশেও প্রগতিশীল শক্তি বলশালী হতে থাকে। কমিউনিস্ট আন্দোলন অবিশ্বাস্য গতি পেয়ে যায়।

স্তালিনযুগে এই ধারা শুধু অব্যাহত ছিল না, প্রবল গতিবেগ পেয়েছিল। বহুসমালোচিত তিরিশের দশকে, এমনকি দ্বিতীয় বিযুদ্ধের মধ্যে ও পরেও সোভিয়েত তথা কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের উদ্যোগে ও উৎসাহে দেশে দেশে কমিউনিস্ট আন্দোলন শক্তিশালী হতে থাকে। বিশের দশকের শেষ দিকে চীনের বিপ্লব ব্যর্থ হলেও পরবর্তী বিপ্লবে সাফল্যের ক্ষেত্রে তার এক বিশেষ ভূমিকা ছিল।

চীন থেকে লাতিন আমেরিকা সর্বত্রই মানুষের মুক্তি সংগ্রামে দেখা যায় অগ্রগতির ছবি। এর পেছনে সোভিয়েতের অবদানের এক বিশেষ ভূমিকা ছিল।

চীন, ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, মালয়, ইন্দোনেশিয়া, মিশর অথবা ইরানের মতো দেশগুলির সংগ্রাম ও সে সংগ্রামে সোভিয়েতের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ অবদানের কথা বহুজ্ঞাত। তুলনামূলকভাবে কম জানা লাতিন আমেরিকার কয়েকটি দেশের দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।

চীনে যখন বিপ্লব ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছিল সেই সময়ই, ১৯২৭ সালে, ব্রাজিলের কমিউনিস্ট পার্টিকে শাসক গোষ্ঠি বেআইনি ঘোষণা করছিল। আট বছরের চেষ্টায় ১৯৩৫ সালে পার্টি এক অভ্যুত্থানের চেষ্টা করে। সে চেষ্টা সফল হয় নি। কিন্তু পার্টির ত্যাগ ও বীরত্ব মানুষকে আকৃষ্ট করে। পরবর্তীকালে ১৯৪৫ সালে আইনি হওয়ার পর ভোটের লড়াইয়ে পার্টি নামতেই জনগণের আশীর্বাদের প্রকাশ ঘটে। ৬ লক্ষের বেশি ভোট পেয়ে আইন সভায় ১৪টি আসন দখল করে পার্টি। পরের দু'বছরে (১৯৩৭) পার্টির ভোট বেড়ে যায় ৮ লক্ষে। বস্তুত পক্ষে সোভিয়েত নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সহায়তায় ব্রাজিলে পার্টির বিপুল অগ্রগতি ঘটে। ব্রাজিলই উপহার দেয় লাতিন আমেরিকার তৎকালীন সবচেয়ে জনপ্রিয় কমিউনিস্ট নেতা, লুই কার্লোস প্রেস্টেসকে।

সে সময় চিলিতেও কমিউনিস্টরা সাফল্য লাভ করতে থাকে। লাতিন আমেরিকার কমিউনিস্টরা ক্ষমতার স্বাদ প্রথম পায় চিলিতেই। মস্কোর ভাবনা অনুসরণ করে কমিউনিস্টরা চিলির র‍্যাডিকাল পার্টির ভেতরে থেকে কাজ করছিল। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে তারা যথেষ্ট জনসমর্থন পেয়ে 'কংগ্রেসে' অনেকগুলি আসন পেয়ে যায়। ১৯৪১ সালের নির্বাচনে তাদের ভোট ও আসনসংখ্যা আরও বৃদ্ধি পায়। তাদের আর উপেক্ষা করা যায় না দেখে ১৯৪৬ সালে রাষ্ট্রপতি গ্যাব্রিয়েল গঞ্জালেস ভিদেলা তিনজন কমিউনিস্ট ডেপুটিকে ক্যাবিনেটে স্থান দেন।

আর্জেন্টিনিয়ান কমিউনিস্ট পার্টি জন্মের অল্পকাল পরেই, ১৯৩০ সালে বেআইনি হয়ে যায়। ১৯৪৫ পর্যন্ত টিকে থাকার জন্যে তাদের কঠিন সংগ্রাম

করতে হয়। শাসন ক্ষমতায় আসার কিছুদিনের মধ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তাঁর সংঘাত শু হওয়ার পর তিনি পার্টির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেন। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট কেন্দ্রের সহায়তায় পার্টি বৃদ্ধি পেতে থাকে।

মেক্সিকোর কাহিনীও প্রায় একই ধরনের। বহু টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে যুদ্ধের পর ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে পার্টি সর্বোচ্চ, ৪০ হাজার ভোট পায়। কিন্তু শুধুমাত্র প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা দিয়ে তখনকার পার্টির প্রভাব বিচার করা যাবে না। মেক্সিকোর পার্টির নেতা ভিনসেন্তে লোম্বার্দো তোলেদানো ছিলেন সমগ্র লাতিন আমেরিকার প্রধানতম কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবি ও রাজনৈতিক নেতা। তাঁর ক্ষমতা ও প্রভাবের উৎস ছিল শ্রমিক সংগঠনে তার ভূমিকা এবং লেখক ও বাগ্মী হিসাবে তাঁর প্রতিভা। তাঁর শ্রমিক সংগঠন ও তিনি যে প্রভাব অর্জন করেন তার পেছনে ছিল সোভিয়েতের মতাদর্শগত প্রেরণা এবং কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের অবদান।

কিউবাতে কমিউনিস্ট সংগঠন গড়ে ওঠে মাচাদো-র চরম দুর্নীতিগ্রস্ত শাসনকালে (১৯২৫-১৯৩৩)। ১৯৪৭ সালের নির্বাচনে পার্টি দুই লক্ষাধিক ভোট পায়। কিন্তু তারপরেই তাদের প্রভাব হ্রাস পেতে থাকে। পরবর্তীকালে ১৯৫২ সালে বাতিস্তা পুনরায় ক্ষমতা দখল করার পর পার্টিকে বেআইনি ঘোষণা করে। পার্টির পত্রিকা বন্ধ করে দেয়। শ্রমিক-কৃষক-জনগণের ওপর চাপিয়ে দেয় এক স্বৈরাচারী শাসন। এর বিদ্ধে পার্টি যে বিপুল গণ-আন্দোলন গড়ে তোলে তার পেছনেও ছিল সোভিয়েতের প্রেরণা।

সম্ভবত সে যুগে লাতিন আমেরিকার কমিউনিস্টরা সবচেয়ে চমকপ্রদ সাফল্য অর্জন করে গুয়াতেমালায়। দীর্ঘকাল বহু গণসংগঠনের মধ্যে কাজ করে, বহু ত্যাগ স্বীকার করে জনগণের স্বার্থে লড়াই করে, শেষ পর্যন্ত পার্টি বিপুল জনসমর্থন অর্জন করে। পার্টির নেতা আর্বেন্‌জ্‌ গুজম্যান রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হন। চার বছর ধরে তিনি ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানির মতো মার্কিন বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান সহ বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করেন। তাঁর শাসনে জনগণ নানা ধরণের 'রিলিফ'-ও পায়। কিন্তু ১৯৫৪ সালে কাস্তিলো আর্মাস এক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে কমিউনিস্টদের ক্ষমতাচ্যুত করে।

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতোই লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতেও কমিউনিস্ট আন্দোলন ও সংগঠন গড়ে তোলা, জনগণের স্বার্থরক্ষায় গণআন্দোলন সংগঠিত করা, নানা ধরনের প্রগতি আন্দোলন গঠন ও সংহত করার পেছনে সোভিয়েত তথা কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের একটা বড় ভূমিকা ছিল। আবার এ বিষয়েও সন্দেহ নেই, লাতিন আমেরিকার এইসব দেশগুলিতে মানুষের আন্দোলন ও কমিউনিস্টদের সংগ্রামের উত্থান-পতন এবং কখনও কখনও নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া ও ইতিহাস গভীর মনোযোগ দিয়ে অনুধাবন করেই ফিদেল কাস্ত্রো, চে-গুয়েভারা প্রমুখ কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা তাঁদের বিপ্লবের পথ নির্ধারণ করেছিলেন। সে পথ ছিল একান্তভাবে তাঁদের নিজস্ব এবং একান্তভাবেই লাতিন আমেরিকার নিজস্ব চরিত্রের।

সমস্ত কথার পরেও, বৃক্ষ, এবং তার ফুল ও ফল যেমনই হয়ে থাক, যাঁরা বীজ ছড়িয়েছিলেন তাঁদের ভূমিকা ভোলা যায় না। এবং যাঁরা, যে-রাষ্ট্র ও আন্দোলন, সে-বীজ হাতের কাছে এগিয়ে দিয়েছিলেন এবং ছড়ানোর কাজে প্রেরণা দিয়েছিলেন তাঁদের অবদানও অস্বীকার করা যায় না।

।। চার ।।

কমিউনিস্ট আন্দোলন বা প্রগতির সংগ্রামের অগ্র অথবা পশ্চাদগতি এবং তাতে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা বা অবদান বিচারে আদৌ আগ্রহী নন এমন মানুষ অতীতেও ছিলেন, আজও আছেন, সর্বত্রই। বস্তুত সংখ্যায় তাঁরাই বিপুল গরিষ্ঠ। তাঁদেরও অনেকে ২০০৩-এ ইঙ্গ-মার্কিন জোটের ইরাক অভিযানের পর ভেবেছেন এবং এখনও ভাবেন যদি সোভিয়েত ইউনিয়ন থাকত, পারত কি ওরা এমন একটা ভয়ংকর কাণ্ড ঘটাতে! তাঁরা কেন এ কথা ভাবেন?

যাঁরা খোঁজখবর রাখেন তাঁরা তো জানেনই, যাঁরা এ ব্যাপারে তেমন দড় নন তাঁরাও তাঁদের অভিজ্ঞতা থেকেই জানেন, রাশিয়া যতদিন সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল, ততদিন তার

১) সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ভূমিকা ছিল এবং

২) দুই 'সুপার পাওয়ারের' এক 'পাওয়ার' হিসাবে সে এমন একটা ভূমিকা পালন করত যাতে পৃথিবীতে শক্তির একটা ভারসাম্য বজায় থাকে।

১৯১৯ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর গঠিত হয়েছিল 'লিগ অফ নেশনস।' লিগ গঠনের পেছনে প্রধানত দুটি উদ্দেশ্য কাজ করেছিল।

১) যুদ্ধ শেষ হলেও ত্রাস ও অবিশ্বাসের যে-পরিবেশ তখনও ইওরোপের রাষ্ট্রগুলিকে সন্ত্রস্ত করে রেখেছিল — কে কখন কাকে আক্রমণ করে বসে — সেই পরিবেশের অন্ত ঘটিয়ে 'যৌথ নিরাপত্তার' গ্যারান্টি সৃষ্টি করা।

২) বিশ্বে 'শক্তির এক ভারসাম্য' স্থাপন করা।

দুটি লক্ষ্যের একটিও লিগ অর্জন করতে পারে নি। ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার মাত্র কুড়ি বছরের মধ্যেই ১৯৩৯ সালে শু হয়ে যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। তার আগেই সমাপ্তি ঘটে 'লিগ অফ নেশনসের'। লিগ গঠনের সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের বস্তুতপক্ষে কোনও ভূমিকাই ছিল না। সে তখন বিপ্লব পরবর্তী এক ঘোর সংকটকাল অতিক্রমে ব্যস্ত। বিপ্লবকে রক্ষা করার জন্য জার্মানির সঙ্গে অত্যন্ত অবমাননাকর 'ব্রেস্ট্‌ লিটভস্ক' চুক্তিও তাকে সে সময় স্বাক্ষর করতে হয়। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর (১৯৪৫) পরিস্থিতি অন্যরকম। সকলেই তখন স্বীকার করছেন, রাশিয়া আক্রমেণ করাই হিটলারের সবচেয়ে বড় ভুল হয়েছিল। স্তালিনগ্রাদের লড়াই-ই যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। যুদ্ধশেষে পট্‌স্‌ডাম সম্মেলনে স্তালিন চুক্তি স্বাক্ষর করতে যান বিজয়ী বীরের বেশে। তাঁর সমপর্যায়ে বিজয়ের মর্যাদার যাঁরা ভাগীদার হতে পারতেন তাঁদের মধ্যে মার্কিন রাষ্ট্রপতি ফ্র্যাংকলিন জভেল্ট মারা যান যুদ্ধের মধ্যেই এবং চার্চিল ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর পদ হারান যুদ্ধের পরেই নির্বাচনে হেরে গিয়ে। যুদ্ধকালে ও যুদ্ধের ফলাফলে সোভিয়েতের এই ত্যাগ বীরত্ব ও গুত্বপূর্ণ ভূমিকার কারণেই রাষ্ট্রসংঘ গঠনে ও স্থাপনেও তার এক বড় ভূমিকা ছিল।

তবু, যুদ্ধশেষে, জঙ্গলে সে-ই যে একমাত্র সিংহ একথা প্রতিষ্ঠা করে দেওয়ার শেষ চেষ্টা করেছিল আমেরিকা। যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পর (চার্লিনের পতন ঘটে ১৯৪৫-এর ৯মে), যুদ্ধের বৃত্ত থেকে বহু দূরে অবস্থিত দুটি নিরীহ শহরে, হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে, সে ভয়ংকর দুটি অ্যাটম বোমা ফেলে (৬ এবং ৯ আগস্ট ১৯৪৬)। যার হাতে এমন শক্তিশালী অস্ত্র আছে তাকে তো সমীহ ও মান্য করে চলতেই হবে! মার্কিন সিংহত্ব একটু ক্ষণস্থায়ীই হয়। ১৯৫৩ সালেই একটি মার্কিন গুপ্তচর বিমান সোভিয়েত সীমান্ত থেকে ফিরে এলে দেখা যায় তার ডানায় কিছু তেজস্ক্রিয় পদার্থ পড়ে আছে। বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে জানিয়ে দেন, সোভিয়েত হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণ করেছে। শু হয়ে যায় পরমাণু অস্ত্রের দৌড়। দুই শিবিরের মধ্যে ঠাণ্ডা যুদ্ধ তো শু হয়ে গিয়েছিল যুদ্ধের শেষ দিকেই।

এই পরমাণু-অস্ত্র-দৌড় ও ঠাণ্ডা যুদ্ধের বহু নেতিবাচক ফলাফল সহ্য করতে হয়েছে পৃথিবীকে। সেই সঙ্গে একথাও মানতে হবে, এই 'দৌড়' ও 'যুদ্ধ' পৃথিবীকে এক 'শক্তির' ভারসাম্য এনে দিয়েছিল। লিগ অফ নেশনস যা পারে নি। রাষ্ট্রসংঘ তা পেরেছিল, বহুল পরিমাণে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার কুড়ি বছরের মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সে যুদ্ধের পর তিন কুড়ি বছর পার হয়ে গেছে, এই সময়কালে বহু স্থানীয় যুদ্ধ হয়েছে, কিন্তু তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শু করতে পারে নি কেউই। এর একটা কারণ যেমন উভয় পক্ষের হাতে মজুদ ধ্বংসের সীমাহীন ক্ষমতাসম্পন্ন পরমাণু অস্ত্র, আর একটি কারণ অবশ্যই দুই শক্তি, মস্কো ও ওয়াশিংটনের মধ্যে টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠা এক ধরনের ভারসাম্য। শক্তির এই ভারসাম্য উভয় পক্ষকেই একটা সীমানার মধ্যে থাকতে বাধ্য করেছে। কেউই লক্ষণরেখা অতিক্রম করতে পারে নি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পরেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বন্দুক হাতে নেমে পড়ে কোরিয়ার রণক্ষেত্রে। কিন্তু কোরিয়াযুদ্ধে মার্কিন সেনানায়ক, অতি প্রতিক্রিয়

াশীল জেনারেল ম্যাকার্থির শত প্ররোচনা সত্ত্বেও যুদ্ধবিরতি সীমানা (থার্টিএইট্থ্ প্যারালাল) অতিক্রম করে ওরা কোরিয়ার উত্তরাংশে বা চীনের ভূখণ্ডে পা র াখতে পারে নি। মার্কিন প্রশাসন চায় নি, শ বাহিনী নেমে যাক যুদ্ধক্ষেত্রে।

তেমনই এর প্রায় পঁচিশ বছর পরে আফগানিস্তানে শত প্ররোচনা ও চোরাগোপ্তা আক্রমণের শিকার হওয়া সত্ত্বেও সোভিয়েত বাহিনী সীমান্ত অতিক্রম করে পাকিস্তানে ঢুকে আক্রমণের উৎসে আঘাত হানতে পারে নি। তারাও চায় নি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার বেনামি যুদ্ধ স্বনামে লড়তে আসুক।

।। পাঁচ ।।

এই দ্বন্দ্ব, দৌড় তথা ভারসাম্যের ফলে পৃথিবীর বহু দেশের, বিশেষ করে উপনিবেশ-শৃংখল-মুক্ত সদ্য স্বাধীন অনেক দেশের উপকার ও কল্যাণও হয়েছে। এবং এইসব ক্ষেত্রে এক বৃহৎ শক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের ইতিবাচক ভূমিকার কল্যাণে আর এক বৃহৎ শক্তি আমেরিকা ও তার সঙ্গীসাথীরা সেইসব সদ্যস্বাধীন দেশের যে-ক্ষতি করতে চেয়েছে বা করে ফেলতে পারত, তা পারে নি।

ইতিহাস সৃষ্টিকারী ভিয়েতনাম যুদ্ধের আগেই ভারত ও চীন সোভিয়েত প্রভাবের সুফল পেয়ে যায়। বিশ্বের ইতিহাসে বৃহত্তম সাম্রাজ্যের মালিক ব্রিটেন তখন একটার পর একটা উপনিবেশ হারিয়ে ভগ্নজানু। কিন্তু শৃগালের চতুরতা মৃত্যু অবধি যায় না। তাই চলে যাওয়ার আগে ভারতকে সে এমনভাবে দুই রাষ্ট্রে ভ াগ করে গেল যাতে উভয়েই ক্রমাগত বিবাদে লিপ্ত থাকে। কাশ্মীর হয়ে গেল সে বিবাদের বড় বিষয়। ভারত-পাকিস্তানের প্রথম যুদ্ধ হলো তারা স্বাধীন হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, কাশ্মীরে, যুদ্ধবিরতিও হলো। এবং তখনই মার্কিন সাহায্যে ব্রিটেন রাষ্ট্রসংঘে প্রস্তাব আনল, দুই রাষ্ট্রের মধ্যে, কাশ্মীরে রাষ্ট্রসংঘের ফৌজ মোতায়েন কর া হোক। ভারত প্রবল আপত্তি জানাল। কিন্তু সে আপত্তিতে কোনও কাজই হত না সোভিয়েত ইউনিয়ন তার পক্ষে, ব্রিটিশ প্রস্তাবের বিদ্ধে 'ভেটো' না দিলে। সো ভিয়েত সেদিন ইঙ্গ-মার্কিন-ফরাসি পরিকল্পনা আটকে না দিলে আজও ভারত ও পাকিস্তানের সীমান্তে, কাশ্মীরে, তারাই সামরিক ঘাঁটি গেড়ে বসে থাকত।

এর কিছুদিন পরেই লাল ফৌজ বেজিং মুক্ত করে। প্রায় সমগ্র চীন মুক্ত হয়ে যায়। চীনা বিপ্লবের দীর্ঘ পথ পরিক্রমা সফল হয়। সে বিপ্লব শ বিপ্লবের মতো সীমান্তের বাইরে নানা দিক থেকে আক্রান্ত হতে পারে নি। বরং বিশ্বের এক বৃহৎ শক্তি সোভিয়েত ইউনিয়ন দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছিল তার পাশে। সদ্য স্বাধীন ভারতবর্ষ বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল তার দিকে। বহু রাষ্ট্র তাকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। চীন বিপ্লব সাফল্যের মুখ দেখেছিল নতুন এক পৃথিবীতে যেখানে সাম্রাজ্যবাদী শিবির তার ইচ্ছামতো শক্তি প্রয়োগ করতে পারে না। সে পৃথিবীতে তার আগ্রাসনের পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সোভিয়েত ইউনিয়ন।

ভিয়েতনামের সুদীর্ঘ ও সুকঠিন মুক্তিযুদ্ধ অর্ধেক সাফল্যের মুখ দেখেছিল পঞ্চাশের দশকের গোড়াতেই। ১৯৫৩ সালে ফরাসিদের দুর্ভেদ্য দুর্গ দিয়েন বিয়েন ফু ভিয়েতনামি গেরিলারা দখল করে নেয় জেনারেল গিয়াপের নেতৃত্বে। সেই যুদ্ধ ও বিজয়ের পেছনে বিপুল অবদান ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের কূটনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক সহায়তার। দিয়েন বিয়েন ফু-র পতনের পর ফরাসি সাম্রাজ্যবাদ ভিয়েতনাম থেকে তার রাজত্ব গুটিয়ে নিয়ে প্যারিসে ফিরে য ায়। যাওয়ার আগে ভিয়েতনামকে দু'ভাগ করে পশ্চিমী শক্তির সাহায্যে তাদের এক পুতুল সরকার বসিয়ে দেয় দক্ষিণ ভিয়েতনামে। কিন্তু উত্তর ভিয়েতনামের মুক্তি ঠেকাতে পারে না কেউই। হো-চি-মিনের নেতৃত্বে সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীন ভিয়েতনামী সরকার। এই আয়োজন জেনেভার আন্তর্জাতিক সম্মেলন থেকে আইনি স্বীকৃতি পায়। সেখানেও পশ্চিমী শক্তির নানা চক্রান্ত ব্যর্থ করে, চীন ও ভারতের সাহায্যে, সম্মেলন থেকে ভিয়েতনামের সপক্ষে একটা সদর্থক সিদ্ধান্ত বের করে অ ানার ব্যাপারে সোভিয়েত ইউনিয়নের ছিল এক বড় ভূমিকা।

এর পরেও বাইশ বছর ধরে ভিয়েতনামকে রক্তক্ষয়ী এবং বহু প্রাণ বলিদানের যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হয় পূর্ণ মুক্তির (১৯৭৫) জন্যে। সে যুদ্ধেও নানা অ ান্তর্জাতিক মঞ্চে কূটনৈতিক লড়াইয়ে তার পক্ষে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন। সেই সঙ্গে আর্থিক ও সামরিক সাহায্য দিয়ে গেছে অবিরাম। ততদিনে চীনও সাহায্য ও বুদ্ধি-পরামর্শদানের অবস্থা অর্জন করে ফেলেছে।

ভিয়েতনাম নিয়ে জেনেভা সম্মেলনের কিছুদিন পরেই সংকট ঘনিয়ে ওঠে আরব দেশে। পাশ্চাত্যের সঙ্গে প্রাচ্যের সহজ ও সুলভ যোগসূত্র সুয়েজ খ ালের কোম্পানিটির কর্তৃত্ব নাসেরের নেতৃত্বে মিশর নিজের হাতে নিয়ে নেয়। ব্রিটিশ ও ফরাসি বণিকমহলের স্বার্থে ঘা লাগে। রণহুংকার দিয়ে নিজেদের নৌবা হিনী দিয়ে সুয়েজ অবরোধ করে ব্রিটেন ও ফ্রান্স (১৯৫৬)। সেই সংকটকালে সোভিয়েত ইউনিয়ন এসে দাঁড়ায় মিশরের পাশে। তার হুমকিতে কাজ হয়। সুয়েজ কোম্পানিতে দেশের বণিকদের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে যদি যুদ্ধ করতে হয়, সে না-হয় করা গেল। কিন্তু সে যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নও নেমে পড়লে বিশ্বযুদ্ধের যে-ঝুঁকি তৈরি হয়ে যায়, তা নেওয়া যে সমীচীন নয় তা বুঝতে ইঙ্গ-ফরাসি শক্তির সময় লাগে নি। তারা অবরোধ তুলে দিয়ে নৌবাহিনীকে সরিয়ে নিয়ে যায়।

তার কিছুদিন পরেই কাস্ত্রো-গুয়েবারাদের নেতৃত্বে বিপ্লব হয়ে যায় কিউবাতে। তখন বিশ্ব পুঁজিবাদের স্বর্গকেন্দ্র ওয়াশিংটন। তার নাকের ওপর একটি সমাজতান্ত্রিক ফোঁড়া সে কেমন করে সহ্য করে? জন্মমুহূর্ত থেকেই কিউবার প্রতি শু হয় তার বৈরি আচরণ। উদ্দেশ্য, সেখান থেকে বিপ্লবী সরকারকে হটিয়ে সাম্র াজ্যবাদের বশংবদ একটি সরকার প্রতিষ্ঠা। অর্থনৈতিক অবরোধ সহ কিউবার বিদ্ধে যাবতীয় ব্যবস্থা নিতে আরম্ভ করে আমেরিকা। কিউবার এই বিপন্ন সময়ে আগ্র াসী সাম্রাজ্যবাদের বিদ্ধে কিউবার পাশে গিয়ে দাঁড়ায় সোভিয়েত ইউনিয়ন। কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক এমনকি সামরিক সাহায্যও দিতে থাকে তাকে।

কিউবাকে সামরিক সাহায্য দান নিয়েই ঘনিয়ে ওঠে ১৯৬২ সালের অক্টোবর সংকট। সোভিয়েত জাহাজ কিউবাতে পরমাণু অস্ত্র নিয়ে চলেছে, এই অভিযোগ করে সোভিয়েত জাহাজকে ঘিরে ফেলে মার্কিন নৌবাহিনী। সোভিয়েত জাহাজ ফিরে যেতে প্রস্তুত নয়। মার্কিন যুদ্ধ জাহাজ কোনওমতেই তাকে কিউব ার দিকে এগোতে দেবে না। দুই বৃহৎ শক্তি ইতিপূর্বে কখনও এমন সংঘাতে মুখোমুখি হয় নি। বিশ্বময় সর্বত্র তাদের প্রত্যেকটি সামরিক ঘাঁটি, সমগ্র সৈন্যবাহিনী, পরম াণু অস্ত্রসহ সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত। 'কিউবা সংকট' সেদিন পৃথিবীকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের একেবারে শেষ কিনারায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। এমন পরিস্থিতি তার আগে কখনও হয় নি। পরেও, অন্তত আজ পর্যন্ত হয় নি।

পরিস্থিতি যুদ্ধ পর্যন্ত গড়াল না। শুভবুদ্ধির জয় হল। কেনেডি ও খ্রুশ্চভের মধ্যে সমঝোতা হল। কাস্ত্রো তাতে সম্মতি জানালেন। ওয়াশিংটন বিপ্লবী সরক ারের নেতৃত্বে কিউবাকে মেনে নিল এবং কথা দিল তাকে আক্রমণ করবে না। বিনিময়ে মস্কো ও হাভানা তাকে অস্ত্রমুক্ত করল, কিউবার মাটিতে কোনও পরমাণু অস্ত্রকেন্দ্র স্থাপিত হবে না।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এবং শক্তির ভারসাম্য রক্ষাকারী এমন অনেক ঘটনারই দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। আর একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করে এ প্রসঙ্গ শেষ করা যাক।

পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা ভাষার সপক্ষে যে-আন্দোলন গড়ে ওঠে এবং যে-আন্দোলন এক ধরনের বাঙালি জাতীয়তাবাদের জন্ম দেয় তা ক্রমে পাক স্বৈরাচ ারী সরকারের বিদ্ধে মুক্তি আন্দোলনে পরিণত হয়। পাক সেনা সে আন্দোলনকে রক্তের বন্যায় ডুবিয়ে দিতে চাইলে আন্দোলন মুক্তিযুদ্ধের চেহারা নেয়। সে যুদ্ধে ন ানা ঐতিহাসিক কারণ ও ঘটনার মধ্যে দিয়ে ভারতীয় ফৌজও বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাদের পাশে দাঁড়িয়ে যায়। যুদ্ধে পাক সেনারা যুদ্ধ হলো তারা স্বাধীন হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, কাশ্মীরে, যুদ্ধবিরতিও হলো। এবং তখনই মার্কিন সাহায্যে ব্রিটেন রাষ্ট্রসংঘে প্রস্তাব আনল, দুই রাষ্ট্রের মধ্যে, কাশ্মীরে রাষ্ট্রসংঘের ফৌজ মোতায়েন কর া হোক। ভারত প্রবল আপত্তি জানাল। কিন্তু সে আপত্তিতে কোনও কাজই হত না সোভিয়েত ইউনিয়ন তার পক্ষে, ব্রিটিশ প্রস্তাবের বিদ্ধে 'ভেটো' না দিলে। সো ভিয়েত সেদিন ইঙ্গ-মার্কিন-ফরাসি পরিকল্পনা আটকে না দিলে আজও ভারত ও পাকিস্তানের সীমান্তে, কাশ্মীরে, তারাই সামরিক ঘাঁটি গেড়ে বসে থাকত।

এর কিছুদিন পরেই লাল ফৌজ বেজিং মুক্ত করে। প্রায় সমগ্র চীন মুক্ত হয়ে যায়। চীনা বিপ্লবের দীর্ঘ পথ পরিক্রমা সফল হয়। সে বিপ্লব শ বিপ্লবের মতো সীমান্তের বাইরে নানা দিক থেকে আক্রান্ত হতে পারে নি। বরং বিশ্বের এক বৃহৎ শক্তি সোভিয়েত ইউনিয়ন দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছিল তার পাশে। সদ্য স্বাধীন ভারতবর্ষ বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল তার দিকে। বহু রাষ্ট্র তাকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। চীন বিপ্লব সাফল্যের মুখ দেখেছিল নতুন এক পৃথিবীতে যেখানে সাম্রাজ্যবাদী শিবির তার ইচ্ছামতো শক্তি প্রয়োগ করতে পারে না। সে পৃথিবীতে তার আগ্রাসনের পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সোভিয়েত ইউনিয়ন।

ভিয়েতনামের সুদীর্ঘ ও সুকঠিন মুক্তিযুদ্ধ অর্ধেক সাফল্যের মুখ দেখেছিল পঞ্চাশের দশকের গোড়াতেই। ১৯৫৩ সালে ফরাসিদের দুর্ভেদ্য দুর্গ দিয়েন বিয়েন ফু ভিয়েতনামি গেরিলারা দখল করে নেয় জেনারেল গিয়াপের নেতৃত্বে। সেই যুদ্ধ ও বিজয়ের পেছনে বিপুল অবদান ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের কূটনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক সহায়তার। দিয়েন বিয়েন ফু-র পতনের পর ফরাসি সাম্রাজ্যবাদ ভিয়েতনাম থেকে তার রাজত্ব গুটিয়ে নিয়ে প্যারিসে ফিরে যায়। যাওয়ার আগে ভিয়েতনামকে দু'ভাগ করে পশ্চিমী শক্তির সাহায্যে তাদের এক পুতুল সরকার বসিয়ে দেয় দক্ষিণ ভিয়েতনামে। কিন্তু উত্তর ভিয়েতনামের মুক্তি ঠেকাতে পারে না কেউই। হো-চি-মিনের নেতৃত্বে সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীন ভিয়েতনামী সরকার। এই আয়োজন জেনেভার আন্তর্জাতিক সম্মেলন থেকে আইনি স্বীকৃতি পায়। সেখানেও পশ্চিমী শক্তির নানা চক্রান্ত ব্যর্থ করে, চীন ও ভারতের সাহায্যে, সম্মেলন থেকে ভিয়েতনামের সপক্ষে একটা সদর্থক সিদ্ধান্ত বের করে আনার ব্যাপারে সোভিয়েত ইউনিয়নের ছিল এক বড় ভূমিকা।

এর পরেও বাইশ বছর ধরে ভিয়েতনামকে রক্তক্ষয়ী এবং বহু প্রাণ বলিদানের যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হয় পূর্ণ মুক্তির (১৯৭৫) জন্যে। সে যুদ্ধেও নানা আন্তর্জাতিক মঞ্চে কূটনৈতিক লড়াইয়ে তার পক্ষে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন। সেই সঙ্গে আর্থিক ও সামরিক সাহায্য দিয়ে গেছে অবিরাম। ততদিনে চীনও সাহায্য ও বুদ্ধি-পরামর্শদানের অবস্থা অর্জন করে ফেলেছে।

ভিয়েতনাম নিয়ে জেনেভা সম্মেলনের কিছুদিন পরেই সংকট ঘনিয়ে ওঠে আরব দেশে। পাশ্চাত্যের সঙ্গে প্রাচ্যের সহজ ও সুলভ যোগসূত্র সুয়েজ খালের কোম্পানিটির কর্তৃত্ব নাসেরের নেতৃত্বে মিশর নিজের হাতে নিয়ে নেয়। ব্রিটিশ ও ফরাসি বণিকমহলের স্বার্থে ঘা লাগে। রণহুংকার দিয়ে নিজেদের নৌবাহিনী দিয়ে সুয়েজ অবরোধ করে ব্রিটেন ও ফ্রান্স (১৯৫৬)। সেই সংকটকালে সোভিয়েত ইউনিয়ন এসে দাঁড়ায় মিশরের পাশে। তার হুমকিতে কাজ হয়। সুয়েজ কোম্পানিতে দেশের বণিকদের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে যদি যুদ্ধ করতে হয়, সে না-হয় করা গেল। কিন্তু সে যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নও নেমে পড়লে বিশ্বযুদ্ধের যে-ঝুঁকি তৈরি হয়ে যায়, তা নেওয়া যে সমীচীন নয় তা বুঝতে ইঙ্গ-ফরাসি শক্তির সময় লাগে নি। তারা অবরোধ তুলে দিয়ে নৌবাহিনীকে সরিয়ে নিয়ে যায়।

তার কিছুদিন পরেই কাস্ত্রো-গুয়েবারাদের নেতৃত্বে বিপ্লব হয়ে যায় কিউবাতে। তখন বিশ্ব পুঁজিবাদের স্বর্গকেন্দ্র ওয়াশিংটন। তার নাকের ওপর একটি সমাজতান্ত্রিক ফোঁড়া সে কেমন করে সহ্য করে? জন্মমুহূর্ত থেকেই কিউবার প্রতি শু হয় তার বৈরি আচরণ। উদ্দেশ্য, সেখান থেকে বিপ্লবী সরকারকে হটিয়ে সাম্রাজ্যবাদের বশংবদ একটি সরকার প্রতিষ্ঠা। অর্থনৈতিক অবরোধ সহ কিউবার বিদ্ধে যাবতীয় ব্যবস্থা নিতে আরম্ভ করে আমেরিকা। কিউবার এই বিপন্ন সময়ে আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদের বিদ্ধে কিউবার পাশে গিয়ে দাঁড়ায় সোভিয়েত ইউনিয়ন। কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক এমনকি সামরিক সাহায্যও দিতে থাকে তাকে।

কিউবাকে সামরিক সাহায্য দান নিয়েই ঘনিয়ে ওঠে ১৯৬২ সালের অ*োবর সংকট। সোভিয়েত জাহাজ কিউবাতে পরমাণু অস্ত্র নিয়ে চলেছে, এই অভিযোগ করে সোভিয়েত জাহাজকে ঘিরে ফেলে মার্কিন নৌবাহিনী। সোভিয়েত জাহাজ ফিরে যেতে প্রস্তুত নয়। মার্কিন যুদ্ধ জাহাজ কোনওমতেই তাকে কিউবার দিকে এগোতে দেবে না। দুই বৃহৎ শক্তি ইতিপূর্বে কখনও এমন সংঘাতে মুখোমুখি হয় নি। বিশ্বময় সর্বত্র তাদের প্রত্যেকটি সামরিক ঘাঁটি, সমগ্র সৈন্যবাহিনী, পরমাণু অস্ত্রসহ সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত। 'কিউবা সংকট' সেদিন পৃথিবীকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের একেবারে শেষ কিনারায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। এমন পরিস্থিতি তার আগে কখনও হয় নি। পরেও, অন্তত আজ পর্যন্ত হয় নি।

পরিস্থিতি যুদ্ধ পর্যন্ত গড়াল না। শুভবুদ্ধির জয় হল। কেনেডি ও খ্রুশ্চভের মধ্যে সমঝোতা হল। কাস্ত্রো তাতে সম্মতি জানালেন। ওয়াশিংটন বিপ্লবী সরকারের নেতৃত্বে কিউবাকে মেনে নিল এবং কথা দিল তাকে আক্রমণ করবে না। বিনিময়ে মস্কো ও হাভানা তাকে আশ্বস্ত করল, কিউবার মাটিতে কোনও পরমাণু অস্ত্রকেন্দ্র স্থাপিত হবে না।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এবং শক্তির ভারসাম্য রক্ষাকারী এমন অনেক ঘটনারই দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। আর একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করে এ প্রসঙ্গ শেষ করা যাক।

পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা ভাষার সপক্ষে যে-আন্দোলন গড়ে ওঠে এবং যে-আন্দোলন এক ধরনের বাঙালি জাতীয়তাবাদের জন্ম দেয় তা ক্রমে পাক স্বৈরাচারী সরকারের বিদ্ধে মুক্তি আন্দোলনে পরিণত হয়। পাক সেনা সে আন্দোলনকে রক্তের বন্যায় ডুবিয়ে দিতে চাইলে আন্দোলন মুক্তিযুদ্ধের চেহারা নেয়। সে যুদ্ধে নানা ঐতিহাসিক কারণ ও ঘটনার মধ্যে দিয়ে ভারতীয় ফৌজও বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাদের পাশে দাঁড়িয়ে যায়। যুদ্ধে পাক সেনারা যখন কোণঠাসা এবং বিপর্যয়ের সম্মুখীন তখন তাদের সাহায্য করতে খুলনা ও চালনা বন্দরে এসে হাজির হয় পাকিস্তানের পুরনো মিত্র ও বড় সহায়ক মার্কিন দেশের সপ্তম নৌবাহিনী। পরিস্থিতি সংকটজনক হয়ে ওঠে। ভারতবর্ষের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের মৈত্রী ও সহযোগিতা চুক্তি ছিল। সেই চুক্তি মতো সোভিয়েত ইউনিয়ন ঘোষণা করে, মার্কিন নৌবহর হস্তক্ষেপ করলে তারা হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না। এবং তাদের নৌবহর কাছেই আছে।

সপ্তম নৌবহর নীরবে সরে যায় বঙ্গোপসাগর থেকে। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ঢাকায় ৯০ হাজার পাক সেনা আত্মসমর্পণ করে। বাংলাদেশের জন্ম হয়।

পৃথিবীর সাত সমুদ্র পাঁচ মহাদেশে সত্তর বছর ধরে সোভিয়েত ইউনিয়নের এই ভূমিকার খবর যাঁরা রাখেন, এ-ভূমিকার কিছু অংশও যাদের অভিজ্ঞতার অংশ হয়ে আছে, তাঁদের তো মনে হতেই পারে, আজ যদি সোভিয়েত ইউনিয়ন থাকত!

যাঁদের কাছে সমাজতন্ত্র বা সোভিয়েত আদর্শের কোনও আবেদন নেই। এমনকি যাঁরা সাম্যবাদী আদর্শের বিরোধী, তাঁরাও এভাবেই ভাবেন, অন্তত ভাবতেই পারেন। তাঁদের কাছে শ দেশ এক বৃহৎ শক্তি। সে থাকলে আর এক বৃহৎ শক্তি আমেরিকা একাই তার ইচ্ছামতো কাজ করে যেতে পারত না। দুই বৃহতের অস্তিত্ব এক ধরনের শক্তির ভারসাম্য রচনা করে বিশ্বকে আজকের চেয়ে নিরাপদ বাসভূমিতে পরিণত করতে পারত। শুধু যদি সোভিয়েত ইউনিয়ন ... ...

।। ছয় ।।

সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং তার সহযোগী সমাজতান্ত্রিক শিবির বিলীন হয়ে গেছে প্রায় দেড় যুগ আগে। এখন 'যদি সোভিয়েত ইউনিয়ন থাকত' ভাবার কোনও অর্থ নেই। কথাটা লিখেই মনে হল, একেবারেই কি নেই? কল্পনারও তো অর্থ থাকে। এবং স্বপ্নের।

স্বপ্নে, কল্পনায়, ভাবনায় যে সোভিয়েত ইউনিয়ন, সে কোন সোভিয়েত ইউনিয়ন? লেনিন থেকে ব্রেজনেভের সোভিয়েত ইউনিয়ন একরকম। গর্বাচভের আর এক রকম। গর্বাচভের সোভিয়েত ইউনিয়ন যদি আজও থাকত তবে কি সে তার ঐতিহ্য অনুসরণ করে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভূমিকা পালন করত? তাঁর কর্মকালে যা যা ঘটেছে, গ্লাসনস্ত ও পেরেস্ত্রৈকার নামে যা যা করা হয়েছে, তাতে সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতার কোনও চিহ্ন কি কারও চোখে পড়েছে? বরং সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে ক্রমাগত নিজের শক্তি হ্রাস করা হয়েছে। করতে করতে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙেচুরে গেছে। গর্বাচভ স্বয়ং পরিণত হয়েছেন এমন

একে রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি যে রাষ্ট্রটিই আর নেই পৃথিবীর ম্যাপে এবং তাঁর দেশ, শদেশ, এই সমগ্র প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে পরিণত হয়েছে মার্কিন ডলারের মুখাপেক্ষি এক তৃতীয় শ্রেণীর আন্তর্জাতিক শক্তিতে। সে কি চাইলেও পারে বিশ্বের 'হাইপার পাওয়ার'কে ঠেকাতে? গর্বাচভের সোভিয়েত ইউনিয়ন যদি আজও থাকত, পুটিনের রাশিয়া যেটুকু মার্কিন বিরোধিতা করেছে তার চেয়ে একটুও বেশি করত কি? করতে পারত কি?

সোভিয়েত ইউনিয়ন, প্রকৃত অর্থে সোভিয়েত ইউনিয়ন, যার কিছু কর্মকাণ্ডের কথা আলোচনা করা গেল, সে বিলীন হয়ে যেতেই পৃথিবীর পরিবর্তন হয়ে গেছে, প্রায় গুণগত পরিবর্তন। নতুন এই পৃথিবী এক—সিংহের জঙ্গল। এ জঙ্গলে টিকে থাকার তিনটিই পথ।

১) সিংহমশাই-এর ল্যাজ অনুসরণ করে চলা। তাই করেছে ব্রিটেন থেকে পোল্যাণ্ড পর্যন্ত চল্লিশটির মতো রাষ্ট্র।

২) মুখে কিছু বিরোধিতা করলেও সতর্ক লক্ষ্য রাখা, কর্মে তার কোনও প্রতিফলন না ঘটে। খানিকটা ভয়ে, খানিকটা লোভে তাই করেছে ফ্রান্স, জার্মানি, রাশিয়ার মতো অনেক বড় ও ছোট ছোট দেশ।

৩) প্রতিবাদ বা সমালোচনা বলে মনে হলেও হতে পারে, অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে এমন কিছু অস্পষ্ট উচ্চারণ ও ধোঁয়াটে শরীরী ভাষা ব্যবহার করেই নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়া। মন ও বিবেক পরিষ্কার রাখার জন্যে বারবার বলা যেতে পারে পৃথিবীর ভালো হোক। পৃথিবীর সকলে ভালো হয়ে যাক। বিশ্বের সকল মানুষ ভালো থাকুক।

যেসব কমিউনিস্ট দেশে গর্বাচভের আবির্ভাব ঘটে নি অথবা তাঁর ছায়া পড়ে নি, যারা গ্লাসনস্ত বাতিল করে দিয়ে সর্বহারা শ্রেণী তথা পার্টির একনায়কত্বের পথই আঁকড়ে ধরে আছে, তাদের শ্রেণী ভূমিকা, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভূমিকার কী হল? ঠিক কোন ভূমিকায় দেখা দিল চীন কিংবা ভিয়েতনাম? সমগ্র 'ইরাকপর্বে' স্পষ্ট হয়ে গেল, ঝিায়নের এই যুগে, এক সিংহের এই জঙ্গলে 'সার্স' বড় কঠিন রোগ এবং ডলার বড় মূল্যবান বস্তু।

তবে কি সবই শূন্য? মানুষ, অসহায়, বিপন্ন মানুষ ভরসা করতে পারে, বিশ্বাস রাখতে পারে, আঁকড়ে ধরে বাঁচতে পারে, অন্তত বেঁচে আছি, বেঁচে আছি এই অনুভূতিটুকু নিয়ে নিশ্বাস নিতে পারে এমন কেউ, এমন কিছুই কি তবে নেই?

মানুষের জন্যে মানুষ আছে। বড় বড় মাপের বহু মানুষ আছেন। নোবেল পুরস্কার পাওয়া বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, কবি আছেন। বড় বড় গায়ক নৃত্যশিল্পী, চিত্রকর আছেন। চলচ্চিত্র জগতের খ্যাতনামা শিল্পীরা আছেন যাঁরা অস্কার পুরস্কারের অনুষ্ঠানকে বুশবিরোধী প্রতিবাদের মঞ্চে পরিণত করতে পারেন। দেশে দেশে আছেন এঁরা। সবচেয়ে বেশি করে আছেন খোদ আমেরিকায়। এঁদের সঙ্গে, এঁদের সহায় হয়ে আছেন পাঁচ মহাদেশের কোটি মানুষ যাঁরা একদিনে, ১৫ ফেব্রুয়ারি পৃথিবীর একশটি শহরে প্রায় অভ্যুত্থান ঘটিয়ে দিয়েছিলেন। আছেন লণ্ডনের সব পথঘাট অচল করে দেওয়া সেই দশ লক্ষ মানুষ। এই মানুষই ভরসা। সবচেয়ে বেশি ভরসা আমেরিকার মানুষ। যুদ্ধ শুর আগে থেকে আজ পর্যন্ত তাঁরা ক্রমাগত সংগ্রাম ক্ষেত্রে আছেন। অনেকেই লাঠি খেয়েছেন। অনেকে হাসপাতালে আছেন। অনেকে কারাগারে আছেন। তবু আছেন। ঝিময় মানুষের এমন শান্তি অভিযান, যুদ্ধের বিদ্ধে এমন বিপুল অভ্যুত্থান কখনও দেখা যায় নি। এমনকি ভিয়েতনামের সময়ও না। এর যত মূল্য তার সবই কি মূল্যহীন হতে পারে?

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com